শরৎচন্দ্রের

বিরাজ-বৌ

নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন ঃ

শরৎচন্দ্রের

"বিরাজ-বৌ"

(গল্প অবলম্বনে রচিত চিত্র)

—চরিত্র—

ছবি বিশ্বাস, সিধু গাঙ্গুলী, দেবী মুখার্জ্জী,

তুলসী চক্রবর্ত্তী, হরিমোহন, রঞ্জিত রায়, বুদ্ধদেব, আদিত্য, নকুল, বোকেন চট্টো, আশু বোস (এ্যাঃ), কেষ্টদাস, ভোলানাথ, প্রভৃতি

ও

সুনন্দা দেবী, বন্দনা দেবী, দিপালী, লক্ষ্মী, মায়া দেবী, মায়া বসু, শুক্তিধারা, মনোরমা, কোহিনুরবালা, রাজলক্ষ্মী

আবহ-গীত—রাধারাণী

পরিচালক ঃ **অমর মল্লিক**

সুরশিল্পী ঃ রাইচাঁদ বড়াল

চিত্র-নাট্যকার ঃ নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-শিল্পী ঃ শৈলেন বসু

শব্দধর ঃ অতুল চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ হরিদাস মহলানবীশ

রসায়ণাগারাধ্যক্ষ ঃ পাঁচুগোপাল নন্দন

গীতিকার ঃ প্রণব রায়

শিল্প-নির্দ্দেশক ঃ মনি সামন্ত, ভোলানাথ ভট্টাঃ

ব্যবস্থাপক ঃ খগেন পাঠক

প্রবর্দ্ধক ঃ **যতীন্দ্রনাথ মিত্র**

ঃ সহকারী ঃ

পরিচালনায় ঃ ধীরেন সাহা, সুবোধ রায়

চিত্র-শিল্পে ঃ প্রভাত ঘোষ, কেষ্ট মুখার্জ্জি

শব্দ-ধারণে ঃ মণি বোস, ক্ষেত্র ভট্টাচার্য্য

সুর-শিল্পে ঃ জয়দেব শীল, হরিপদ চট্টোঃ

সম্পাদনায় ঃ : : : : সুবোধ রায়

ব্যবস্থাপনায় ঃ : : : : পরিমল বসু

রসায়ণায় ঃ বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার

বিরাজ-বৌ

(কাহিনী)

নীলাম্বর আর পীতাম্বর, দু-ভাই। প্রাচীন বাংলার প্রথা অনুসারে বাল্য-কালেই তাদের দুজনের বিয়ে হয়ে যায়। নীলাম্বরের বউ-রূপে বিরাজ যেদিন শ্বশুর বাড়ীতে আসে, সে-দিন স্বামীকে সে খেলার সাথী রূপেই জানতো। যদিও কিশোর স্বামীটি তখন গ্রামের আব-হাওয়ায় লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট হুকোর সদ্-ব্যবহার করতে শিখে গিয়েছে!

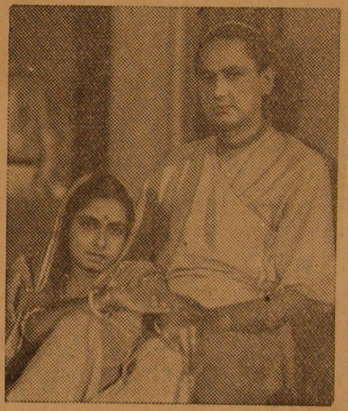

শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর পর বালিকা বিরাজের ওপরই সংসারের ভার পড়ে। সেই বালিকা বয়স থেকেই সে সংসারের কর্ত্রী, তারই ইঙ্গিতে সংসার চলে। বিরাজের সেই শাসনে নিরীহ প্রজার মত মুখ বুঁজে চলতে নীলাম্বরের আপত্তি ছিল না, আনন্দই ছিল। নীলাম্বরের বয়স যত হ'তে লাগলো, ততই সে বুঝলে, সংসারে কাজ-কর্ম্ম, টাকা-কড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে হৈ চৈ যাঁরা করে, তারা ভুল করে। নীলাম্বর শুধু যে বাইরে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল, তা নয়, তার ভেতরের মানুষটিও ছিল মহা-বৈষ্ণব। সংসারের সব ভাবনা, এমন কি তার নিজেরও দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার ভাবনা, সে পরম নিশ্চিন্ত মনে বিরাজের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল। বিরাজ সেখানে তার ছোট্ট সংসারটির মধ্যে ছিল রাজরাজেশ্বরী। সেই ছিল তার গর্ব্ব, সেই ছিল তার জীবন।

কিন্তু ছোটভাই পীতাম্বর ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। সে ছিল কাজের মানুষ। এবং খুব ছোট মানুষ। নিজের স্ত্রীর হাতে সিন্দুকের চাবি দিয়ে সে

নিশ্চিন্ত থাকতে পারতো না। সকলের চেয়ে তার কটু লাগতো, নীলাম্বর সম্পর্কে বড়-বৌ-এর স্বাধীনতা। সর্ব্বদাই তাই সে নিজের স্ত্রীকে কড়া শাসনে রাখতে চাইতো, যাতে বিরাজ-বৌএর হাওয়া লেগে কোন দিন না সে তার ওপরে কর্ত্তৃত্ব ক'রতে আসে।

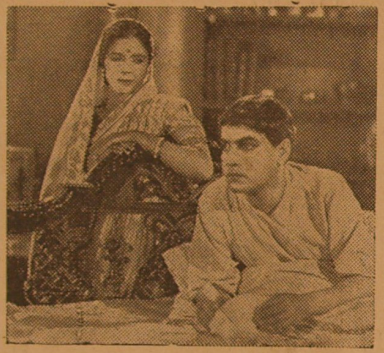

হয়ত দু-ভাই এক সংসারের মধ্যে থেকে, দুজনে দু-পথ দিয়ে হেঁটেও, যা-হোক করে জীবনের মেয়াদ কাটিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু বিপত্তি ঘটালো এসে, যে-জিনিস জগতের সব বিপত্তির মূলে...টাকার অভাব, অর্থাৎ দারিদ্র্য।

ছোট বোন্ পুঁটির বিবাহ উপলক্ষে দু-ভায়ের অন্তরের সেই মহা-পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে বাইরে ফুটে উঠলো। পীতাম্বরের ধারণা হ'লো যে, তার অকেজো বড় ভাইটি, বউ-এর আঁচল ধরে' থাকতে থাকতে এমন অমানুষ হয়ে গিয়েছে, যে, পৈত্রিক-সম্পত্তি থেকেও তাকে বঞ্চিত করতে পারে, সুতরাং নষ্ট হয়ে যাবার আগে, নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়াই ভাল না?

একদিন এই ব্যাপার নিয়ে দু-ভায়ের মধ্যে অতি কুৎসিৎ ঝগড়া হ'য়ে গেল। পীতাম্বর শুধু যে নীলাম্বরকেই আঘাত করলো তা নয়, বিরাজকেও করলো আঘাত। বাড়ীর মধ্যে উঠলো বেড়া। ছোট-বউ চোখের জল ফেলে বারণ করলো। কিন্তু মেয়েমানুষের চোখের জলে কাতর হওয়ার মতন দুর্ব্বল মানুষ পীতাম্বর নয়। নীলাম্বর আঘাত পেলো বটে, কিন্তু আঘাত করলো না। আঘাত করতে পারে না সে। সে জানে, পীতাম্বরের এ ভুল একদিন ভেঙ্গে যাবে.....

বিরাজকেও মুখ বুঁজে এ আঘাত সইতে হ'লো বটে, কিন্তু তা সহ্য করতে গিয়ে তার অভিমানী-মন ভেতর থেকে চিড় খেয়ে গেল। ছোট-বউ বুঝলে, তার স্বামী কত বড় অন্যায় করেছে। কিন্তু তবু সে স্বামী। চোখের জলে সে শুধু ঠাকুরকে জানায়,—ঠাকুর! তুমি ওঁর কোন অপরাধ নিয়ো না!

বেড়ার ভেতর ফুটো করে সে লুকিয়ে বিরাজ-বৌকে ডাকে,—দিদি, দিদি-গো! বিরাজ অভিমানে কাঠ হয়ে থাকে।

এ-দিকে ছোট বোনের শ্বশুরের নির্লজ্জ বায়নায় এবং সামাজিক তার অত্যাচারে নীলাম্বর লুকিয়ে লুকিয়ে ধার করে। বাড়ী বাঁধা দেয়। লুকিয়ে, কেন না, বিরাজ জানতে পারলে মহা-অনর্থ করবে।

এমনি করে' দারিদ্র্যের ছায়া এলো গভীর হয়ে, গভীরতর হ'লো তা, যখন বাইরে থেকে তার ছায়া তাদের দুজনের মনে গিয়ে পড়লো। বিরাজকে লুকিয়ে নীলাম্বর ঋণ করেছিল, বিরাজ যেদিন তা জানতে পারলো, সেদিন, সব চেয়ে তার আঘাত লাগলো, ঋণের জন্য নয়..."তুমি আমাকে লুকিয়েছ...তুমি আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছ..." এই বেদনায়।

নীলাম্বর বাইরের জীবনের রূঢ় ধাক্কায় বুঝতে পারে না বিরাজের মনের সেই সূক্ষ্ম, অথচ তীব্র বেদনার কথা। সামান্য সামান্য ব্যাপারে ইদানীং তাদের মধ্যে দেখা দেয় মতান্তর।

ছোট্ট জিনিস, কিন্তু রেখে যায় মনে গভীর ছাপ.....

এমন সময় গ্রামে এলো, জমিদার...

শীকার করতে বেরিয়ে তাঁর অনুসন্ধানী চোখ গিয়ে পড়লো, স্নানের ঘাটে স্নান-স্নিগ্ধা বিরাজের ওপর।

ছেলে-বেলার ঝি সুন্দরীকে ডেকে বিরাজ বলে, ঐ অসভ্য লোকটা কে রে সুন্দরী?

সুন্দরী রেগে ছুটে এসে দেখে, ওমা, এ যে জমিদার বাবু!
জমিদার বাবু সুন্দরীকে বলে, সময় মত তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে……

সুন্দরী গিয়েছিল দেখা করতে……

দেখা করে' ফিরে আসবার সময় আঁচলে দশটা টাকা বেঁধে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু সেই দশ টাকা নিয়েই তাকে নীলাম্বরের বাড়ী ত্যাগ করতে হ'লো।

বিরাজ স্পষ্ট ভাষায় তাকে বলে দিল, তোর ছায়ায় পাপ আছে!

নীলাম্বর এ-সব ব্যাপারের কিছুই জানতো না। বিরাজও তাকে বলে নি। সুন্দরীকে কেন সে তাড়ালো, সে কথার উত্তরে বিরাজ শুধু বলেছিল, 'সে নিশ্চয়ই কোন দোষ করেছিল, যার জন্যে তাকে তাড়িয়েছি'। রাজ-রাজেশ্বরী যে, সে এর বেশী কি কৈফিয়ৎ দিবে?

কিন্তু হায়, বিধাতা একদিন বিরাজের অন্তরের সে চরম গর্ব্ব অতি রূঢ় ভাবে দিলেন ভেঙ্গে এবং…

এর পর থেকে ছবিই বলুক তার কাহিনী—। শুধু এখানে এইটুকু প্রশ্ন উত্থাপন করে রাখতে চাই, সত্যই কি বিরাজের সে-গর্ব্ব বিধাতা ভেঙ্গেছিলেন? না, সে-গর্ব্বের পূর্ণ মহিমা নিয়ে বিরাজ বিধাতার হৃদ্‌কমলে বিরাজ করছে?

"বিরাজ-বৌ" ঃঃ গান

(১)

আহা গঞ্জন বচন তোর,
শুনে সুখী নাহি ওর,
সুধা সম লাগায়ে মরমে।

(২)

ওঃ ওঃ ওঃ পুবে দেয়া
দে জল, দে জল, দে জল।
চাতক পাখী কাঁদে তোরে ডাকি
বলে দে জল, দে জল।
মরা নদীর বালু চরে,
পিয়াসী প্রাণ হা হা করে
আকাশ গাঙে ভাসিয়ে দেরে
কাজল মেঘের বাদল খেয়া,
ওঃ ওঃ ওঃ পুবে দেয়া।
দে জল, দে জল, দে জল।
মাঠে মাঠে সোনা ফলুক, ঝরুক ফটিক জল,
চাষী বোয়ের পায়ে বাজুক, ঝুমুর ঝুমুর মল।
ওঃ ওঃ ওঃ পুবে দেয়া,
দেব তোরে নতুন ধানের পিঠা করে
তোর গলায় আবার দেব সাতনরীহার,
তুলে নতুন কদম কেয়া।
ওঃ ওঃ পুবে দেয়া
দে জল, দে জল, দে জল।

(৩)

এই না জলের আরসীতে তুই,
দেখ্‌তে পেলি কারে,
তাই বুঝি হায় চার ফেলেছিস্
ধরবি ব'লে তারে।
হায়রে পাগল, পাওয়ার নেশায়
বৃথাই যে তোর দিন কেটে যায়।
পিপাসা তোর মিট্‌বে নারে,
বসে জলের ধারে।
যে বিজলীর রূপের আলো,
নয়নে তোর লাগল ভালো
পিছনে তার বজ্র আছে,
তাও কি দেখিস্ নারে।

(৪)

আমার প্রদীপ খানি তোমার পথেই
আজো রাতে জ্বলে।
আমি বসে' আছি তোমার কাছে
বিদায় নেব বলে'।
এবার শুধু তোমায় দেখে
বিদায় নেব দূরে থেকে,
একটী প্রণাম রেখে যাব শূন্য দেউলে তলে।
হার দিয়ে আর, (আর) বাঁধব না গো
আজ মেনেছি হার,
জানি ভালবাসার বাঁধন টুক্,
আজকে লাগে ভার।
কুসুম যদি ঝরে ধূলায়,
বসন্ত আর ফেরে না হায়
ঝরা স্মৃতির ফুলগুলি তাই,
(তাই) ভাসাই চোখের জলে
আমি বসে' আছি তোমার কাছে
বিদায় নেব ব'লে।

কেশের শ্রী ও সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তোলে

মাথায় একরাশ চুল থাকলেই হয় না। পরিপাটি যত্নের ভেতর দিয়ে কেশের যে শ্রী ও ছন্দ বিকশিত হয়, তার মধ্যেই কেশচর্য্যার সার্থকতা। কেশচর্য্যার একটা বিশেষ উপকরণ ভালো কেশতৈল—এই কথাটা সব সময়েই মনে রাখা দরকার। সাধারণ কেশের শ্রী ও সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলতে **শ্রীকল্যাণ** একটি অসাধারণ কেশতৈল। কারণ এতে যে সব উপাদান আছে তার প্রত্যেকটিই কেশের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

শ্রীকল্যাণ কেশ তৈল

জে ম কে মি ক্যা ল • ক লি কা তা

১৭২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।